বিয়ন্ড ডেমোক্রেসি

কারেল বেকম্যান ও ফ্রাঙ্ক কারস্টেন

বিয়ন্ড ডেমোক্রেসি

অনুবাদ ও সম্পাদনা
রাকিবুল হাসান

ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

বিয়ন্ড ডেমোক্রেসি

মূল : কারেল বেকম্যান ও ফ্রাঙ্ক কারস্টেন

অনুবাদ ও সম্পাদনা : রাকিবুল হাসান

প্রথম প্রকাশ

আগস্ট ২০২২

স্বত্ব

প্রকাশক

প্রচ্ছদ

আবুল ফাতাহ্ মুন্না

প্রকাশক

ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

অফিস : ৭/বি পি কে রায় রোড,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

✆ ০১৭৬৮ ৮৬ ৪৪ ২৮

০১৭৮৯ ৮৫ ৪৬ ০২

বাংলাবাজার পরিবেশক : তারুণ্য প্রকাশন

দোকান নং-১৩, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

✆ ০১৯৭৯ ৫৪ ৬৭ ২২-২১

মুদ্রণ

মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com – wafilife.com

বানান সমন্বয় ও পৃষ্ঠাসজ্জা

মুহিব্বুল্লাহ মামুন

মুদ্রিত মূল্য

২২৫ ৳ মাত্র

উৎসর্জন

লেখকের নিউরন থেকে নামিয়ে জ্ঞানকে বইরূপে পাঠকের হাতে পরিবেশনের কৃতিত্বটা প্রকাশকদের। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে প্রকাশকরা পৃথিবীর সবচেয়ে ‘উৎসর্গবঞ্চিত’ শ্রেণি। এই শ্রেণির একজন সাধারণ সদস্য—ফাউন্টেন পাবলিকেশন্সের চেয়ারম্যান—**আবদুর রহমান আদ-দাখিল** ভাইকে উৎসর্গ করা হলো।

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা	০৯
অনুবাদকের কথা	১১
প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	
গণতন্ত্র : অন্তিম অচলায়তন	১৫
গণতান্ত্রিক বিশ্বাস	১৭
মিথস অব ডেমোক্রেসি	২৩
➢ প্রথম মিথ : সব ভোট গণনা হয়	২৩
➢ দ্বিতীয় মিথ : গণতন্ত্র জনগণের শাসন	২৬
➢ তৃতীয় মিথ : সংখ্যাগুরু সঠিক পক্ষে	৩১
➢ চতুর্থ মিথ : গণতন্ত্র রাজনীতিনিরপেক্ষ	৩৩
➢ পঞ্চম মিথ : গণতন্ত্র উন্নয়নের সোপান	৩৯
➢ ষষ্ঠ মিথ : সম্পদের সুষম বণ্টন এবং দরিদ্রদের সহায়তায় গণতন্ত্র অপরিহার্য	৪৪
➢ সপ্তম মিথ : একত্রে শান্তিতে বসবাস করতে গণতন্ত্র অপরিহার্য	৪৮
➢ অষ্টম মিথ : সমাজবোধ জাগ্রত করতে গণতন্ত্র প্রয়োজন	৫৩
➢ নবম মিথ : গণতন্ত্র : স্বাধীনতা এবং সহনশীলতা	৫৬
➢ দশম মিথ : গণতন্ত্র শান্তির বার্তা প্রচার করে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করে	৬১
➢ একাদশ মিথ : গণতন্ত্রে জনগণ যা চায়, তা পায়	৬৫
➢ দ্বাদশ মিথ : আমরা সবাই গণতন্ত্রী	৬৯
➢ ত্রয়োদশ মিথ : ভালো কোনো বিকল্প নেই	৭২

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণতন্ত্রের সংকট	৭৭
গণতন্ত্রের পাপাচার	৭৯
নবদিগন্ত	৮৭
লিবার্টারিয়ানিজম এবং গণতন্ত্র	১০১
গণতন্ত্র সম্পর্কে কিছু বিখ্যাত উক্তি	১০২
লিবার্টারিয়ানিজম	১০৪

প্রকাশকের কথা

মানবসভ্যতার সূচনাকাল থেকেই পৃথিবীর মানুষ দুইভাগে বিভক্ত—শাসক ও শাসিত। ক্ষুদ্র একদল মানুষ বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শাসন করেছে সবসময়। এটিই পৃথিবীর অমোঘ নিয়ম হিসেবে টিকে আছে। অবশ্য কালের স্রোতধারায়, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে শাসনব্যবস্থার নতুন নতুন রূপ হাজির হয়েছে পৃথিবীতে। ট্রাডিশনাল ইসলামি শাসনধারার বাইরে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতো নানা ঘাট পেড়িয়ে গণতন্ত্রে এসে থেমেছে এই সিলসিলা। কিন্তু তারপর? এখানেই কি শেষ? পশ্চিমা গণতন্ত্রের ব্যাপারে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার সেই বিখ্যাত উক্তিটাই কি টিকে যাবে?

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সংকট ও অস্থিরতা বর্তমান সময়ের বড় সমস্যাগুলোর অন্যতম। ফলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংকট, সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে গবেষকদের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ-সহ এ বিষয়ক খবরাখবর সংবাদমাধ্যমের চটকদার শিরোনাম হয় আজকাল। কিন্তু গতানুগতিক চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে বৃত্তের বাইরে চিন্তা করতে পারা ও কথা বলতে পারা মানুষের সংখ্যা নিতান্তই কম এই ময়দানে।

চিন্তার এই সংকট পৃথিবীজুড়েই। এই জায়গায় এই বইটির লেখকদ্বয় ব্যতিক্রম। গণতন্ত্রের গতানুগতিক সমালোচনার বাইরে সরাসরি এই ব্যবস্থার ওপরই প্রশ্ন তুলেছেন তারা। গণতন্ত্রের তেরোটি মিথের শিরোনামে বলা যায় অসাধারণভাবে কাজটি করেছেন লেখকরা। রাজনৈতিক অস্থিরতার এমন সময়ে এই বইটি যদি প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ, তরুণ রাজনীতি চিন্তক ও সাধারণ পাঠকদের চিন্তার জগতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, বইয়ের লেখকদ্বয় প্রচণ্ডভাবে লিবার্টারিয়ান চিন্তায় প্রভাবিত। আমাদের জায়গা থেকে এই চিন্তাটাও মোটাদাগে গলদ চিন্তা। ফলে লিবার্টারিয়ান চিন্তার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে মূল বইয়ের শেষে নিজ থেকে একটা অধ্যায় যুক্ত করে যারপরনাই প্রশংসাযোগ্য কাজ করেছেন অনুবাদক। এ ছাড়া বাংলাদেশের পাঠকদের দিকে লক্ষ্য করে মূল বইয়ের কিছু জায়গায় সামান্য সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। অনুবাদক হিসেবে রাকিবুল হাসানের কাজ বরাবরই চমৎকার। তার জুড়ি তিনি নিজেই। তার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়াও

বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রিয় কাজিন মহসিনকে, আমাদের অনুরোধে সুদূর আমেরিকা থেকে মূল ইংরেজি বইটি কিনে পাঠিয়েছিলেন তিনি।

পরিশেষে পাঠকদের বলতে চাই, বইটি যদি ভালো লাগে, তাহলে অফলাইনে প্রিয়জনদের মাঝে এবং অনলাইনে বন্ধুদের মাঝে আপনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে ভুলবেন না। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ও নানা সূত্রে যারা এর সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং প্রিয় পাঠক, আপনার জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা।

প্রকাশনার পক্ষে
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

> The best argument against democracy is a five-minute talk with the average voter.—Winston Churchill

পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে বর্তমানে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে—আস্থার সংকট। মার্কিন কোম্পানি গ্যালাপ ২০১২ সালের নভেম্বরে সে দেশের নাগরিকদের মাঝে একটা জরিপ করেছিল, সামাজিক পেশাদার শ্রেণিগুলোর বিশ্বস্ততা নিয়ে। ৫৪ শতাংশ মানুষের মতে কংগ্রেস সদস্যদের বিশ্বস্ততা ভেরি লো বা 'খুবই কম'। অবিশ্বস্ততায় কংগ্রেস সদস্যদের নিচে শুধু একটা শ্রেণি ছিল—গাড়ির সেলসম্যান! তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের কথা বাদই দিলাম। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য-সহ ইউরোপের সমস্ত দেশে সরকার আসে, সরকার যায়। এটি কীসের নিদর্শন? রাজনীতি ও গণতন্ত্রের ওপর জনগণের আস্থার নিদর্শন নাকি অনাস্থা?

এখানে খুব জনপ্রিয় একটি উত্তর হচ্ছে—এটি রাজনৈতিক দলগুলোর সংকট, গণতন্ত্রের অপব্যবহারের সংকট। এই বইতে সেই উত্তর তালাশের চেষ্টা করা হয়েছে যে আদতে এটি কি গণতন্ত্রের অপব্যবহারের সংকট নাকি খোদ গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সংকট। মনে রাখতে হবে—গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। **এক**, শাসনের বৈধতা। **দুই**, শাসনের বিশ্বস্ততা। কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশে এই দুই উদ্দেশ্য একীভূত হয়নি। যদি হতো—সেই দল, সেই সরকার চিরকাল ক্ষমতায় থাকত।

শাসনের বৈধতা একটি প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক বিষয়। ব্যালটে কাগজ ফেলে আমরা সেই বৈধতা প্রদান করি। কিন্তু শাসকের বিশ্বস্ততা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম নয়। গণতন্ত্রে বিশ্বস্ততা নিশ্চিতকরণের কোনো উপায় বাতলানো হয়নি। বারংবার সরকার পরিবর্তন সেই অবিশ্বস্ততার প্রতীক।

প্রসঙ্গত বলি, ইসলামে শাসনের বৈধতা ও বিশ্বস্ততা দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। এবং 'ব্যালট থেকে উৎসারিত' বৈধতার চেয়ে বিশ্বস্ততার মূল্য বেশি। এ নিয়ে পশ্চিম ও পশ্চিম প্রভাবিত চিন্তকদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। ওদিকে ব্যালটে ফেলা কাগজের সংখ্যাবলে সমাজের সবচেয়ে নীচু ও নীতিহীন শ্রেণিগুলো যে ক্ষমতার উচ্চাসন দখল করছে, সে নিয়ে অবশ্য উচ্চবাচ্য নেই। এটি গণতন্ত্রের একটি মৌলিক সংকট। নীতিবান শাসক ছাড়া সুশাসন কীভাবে সম্ভব?

আমাদের মতো খেটে খাওয়া, নিম্নবিত্ত দেশের মানুষ গণতন্ত্রের সমালোচনা করলে সেটা প্রত্যাখ্যাত হবে—স্বাভাবিক। প্রভুভক্তি বলে একটা জিনিস এখনো কলোনাইজড পিপলদের মগজে রয়ে গেছে। তাই সাদা দেশ, প্রভু দেশের চিন্তকদের ভিন্নচিন্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

রাকিবুল হাসান

তাকমিল; মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর
শিক্ষার্থী; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৩/৬/২০২২ খ্রি.

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

গণতন্ত্র : অন্তিম অচলায়তন

‘বর্তমানে যদি গণতন্ত্রের কোনো সংকট থেকে থাকে, শুধু অধিকতর গণতন্ত্রের মাধ্যমেই তা নিরাময় করা সম্ভব’—সুপ্রাচীন উক্তিটি একজন মার্কিন রাজনীতিবিদের। সাধারণত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কীভাবে দেখা হয়, এই উক্তিতে একবাক্যে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সবাই মোটামুটি একমত যে গণতন্ত্রে সমস্যা থাকতে পারে, আমেরিকা-সহ গণতন্ত্রের পশ্চিমা মোড়ল রাষ্ট্রগুলোর সংসদীয় ব্যবস্থায় ক্রুটি থাকতে পারে, হতে পারে সেগুলো পতনের দ্বারপ্রান্তে, কিন্তু গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। গণতন্ত্রের একমাত্র প্রতিষেধক—অধিকতর গণতন্ত্র।

আমাদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সংকটাপন্ন তা অস্বীকারের জো নেই। সর্বত্র গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে মানুষের মোহমুক্তি ঘটছে, তারা বিভক্ত। রাজনীতিবিদদের অভিযোগ ভোটাররা বখে যাওয়া বাচ্চাদের মতো আচরণ করছে। ওদিকে জনগণের অনুযোগ হচ্ছে রাজনীতিবিদরা কুম্ভকর্ণ, জনগণের চাওয়া-পাওয়া তাদের কানে ঢুকে না। ফলে ভোটাররা অস্থিরমতি হয়ে যাচ্ছে। তাদের আনুগত্য বারবার ‘দল পরিবর্তন’ করছে। ক্রমান্বয়ে চরমপন্থা ও পপুলিস্ট দলগুলোর দিকে ঝুঁকছে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সর্বত্রই বিভক্ত, সেই বিভক্তি কাটিয়ে ওঠে কার্যকর সরকার গঠন দিনদিন দুরূহ হয়ে পড়ছে।

বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কোনো হাতিয়ার নেই। প্রকৃত বিকল্প উদ্ভাবনে অক্ষম তারা। তারা দলকেন্দ্রিক ‘ফাঁদে’ বন্দি। তাদের আদর্শ লুট হয়ে গেছে ইন্টারেস্ট গ্রুপ আর লবিস্টদের হাতে। আদতে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারই ব্যয়-নিয়ন্ত্রণে সক্ষম না। তারা ঋণ নিচ্ছে, দেদারসে খরচ করছে, উচ্চমাত্রায় করারোপ করছে, ফলে বারবার অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়তে হচ্ছে। বহু দেশ দেউলিয়া হওয়ার দ্বারপ্রান্তে।

কদাচিৎ সরকারগুলো খরচ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু সমস্যা বাধে অন্যত্র। নিতান্ত সাময়িকভাবে ব্যয়হ্রাসের উদ্যোগ নিলেও ভোটাররা ‘জেগে’ ওঠে। তাদের

বিশ্বাস এটি তাদের ‘অধিকারে’ হস্তক্ষেপ! ফলে বাস্তবে কোনো ধরনের ব্যয়নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। অপরদিকে ব্যয়হুজুগ সত্ত্বেও প্রায় সব গণতান্ত্রিক দেশই ক্রমবর্ধমান উচ্চ-বেকারত্ব সমস্যায় জর্জরিত। জনগণের বৃহদাংশ অপাঙ্‌ক্তেয়। বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্যও কোনো গণতান্ত্রিক দেশই পর্যাপ্ত নীতি প্রণয়ন করতে পারেনি।

> **এটি বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে গণতন্ত্র বর্তমানে একটি ধর্ম হয়ে উঠেছে—আধুনিক সেক্যুলার ধর্ম।**

প্রায় সব গণতান্ত্রিক দেশই মাত্রাতিরিক্ত আমলাতন্ত্র আর ‘নিয়ন্ত্রণতন্ত্রের’ ভারে ন্যুব্জ। রাষ্ট্রের হাত প্রত্যেকের জীবন কুক্ষিগত করে রেখেছে। সূর্যালোকের অধীন প্রতিটি বস্তুই রাষ্ট্রীয় আইন ও নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রকৃত সমাধানের পরিবর্তে সবকিছুকে অধিকতর আইন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কুক্ষিগত করতেই রাষ্ট্রের আগ্রহ বেশি। কিন্তু নিজের প্রধান দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ এবং অনীহ; শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন। অথচ আইনের শাসন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখাই জনগণের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের মূল কাজ।

অপরাধ আর লুটপাট লাগামহীন। পুলিশ এবং বিচারব্যবস্থা অনির্ভরযোগ্য, অথর্ব এবং ক্ষেত্রবিশেষে দুর্নীতিতে জর্জরিত। জনসংখ্যার অনুপাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বন্দি রয়েছে। তাদের অনেকেই বন্দি নিতান্ত গোবেচারা টাইপ কাজের ‘অপরাধে’। বহু গবেষণায় প্রমাণিত যে নির্বাচিত রাজনীতিবিদদের ওপর জনগণের আস্থা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে। সরকার, রাজনৈতিক শাসক, এলিটশ্রেণি এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি-সহ আরও যারা নিজেদেরকে আইনের ঊর্ধ্বে ভাবতে পছন্দ করে তাদের ব্যাপারে জনমনে গুরুতর অবিশ্বাস রয়েছে। বহু মানুষ ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশাগ্রস্ত। তারা আশঙ্কা করছেন তাদের সন্তানদের অধিকতর শোচনীয় পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। অভিবাসীদের ‘আক্রমণে’ নিজস্ব সংস্কৃতি হুমকির মুখে পড়বে। বরং ইতিমধ্যেই জল বহুদূর গড়িয়ে গেছে।

গণতান্ত্রিক বিশ্বাস

যদিও গণতন্ত্রের সমস্যাবলি এখন সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু খোদ গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির তেমন কোনো সমালোচনা নেই বললেই চলে। আমরা যেসব সমস্যায় ভুগছি, সেগুলোর জন্য কেউই গণতন্ত্রকে দায়ী করছে না। কেউই বলছে না গণতন্ত্রই এসব সমস্যার প্রজননকেন্দ্র। বরং সব ঘরানার রাজনীতিবিদরাই—ডান, বাম, মধপন্থী, আমাদের সমস্যাগুলো সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছে, অধিকতর গণতন্ত্রায়ণের মাধ্যমে!

জনগণের কথা শুনবে মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছে, জনকল্যাণকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেবে বলে আশ্বাস দিচ্ছে। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব করবে, অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন করবে, আরও উন্নত সেবা প্রদান করবে, সিস্টেমকে পুনরায় কর্মোপযোগী করে তুলবে। কিন্তু তাদের কেউই খোদ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে না। তারা বরং তর্ক করছেন যে আমাদের সমস্যার সূত্রপাত অতিরিক্ত স্বাধীনতা থেকে, অতিরিক্ত গণতন্ত্রায়ণ থেকে নয়। প্রোগ্রেসিভ এবং কনজার্ভেটিভদের মাঝে বর্তমানে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে—প্রথম দল অতিরিক্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় নাখোশ, দ্বিতীয় দল উদ্‌বিগ্ন লাগামহীন সামাজিক স্বাধীনতা নিয়ে। কিন্তু আমরা যে সর্বগ্রাসী ট্যাক্স আর সর্বব্যাপী আইনের অধীনে বসবাস করছি সে কথাটা বলছেন না। যদি অতিরিক্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে থাকে, তবে কেন আমরা স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি কর দিতে হচ্ছে? যদি লাগামহীন সামাজিক স্বাধীনতাই ভোগ করি, তবে এত এত আইনের গ্যাড়াকল কোত্থেকে এলো?

আসল কথা হচ্ছে খোদ গণতন্ত্রের সমালোচনা পশ্চিমা সমাজে ট্যাবু, অচলায়তন। এখানে আঘাত করা যাবে না। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কীরকম ভুল প্রয়োগ হচ্ছে তা নিয়ে যতখুশি বলতে পারেন, রাজনৈতিক নেতাদের ধুয়ে দিতে পারেন। কিন্তু খোদ গণতান্ত্রিক ‘মূল্যবোধ’ নিয়ে প্রশ্ন? নো, নেভার। এটি বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে গণতন্ত্র এখন ধর্ম হয়ে উঠেছে—আধুনিক, সেক্যুলার ধর্ম! বরং আপনি বলতে পারেন ভূপৃষ্ঠের সর্ববৃহৎ ধর্ম। মিয়ানমার, সুইজারল্যান্ড, ভ্যাটিকান সিটি এবং কিছু আরব রাষ্ট্র-সহ মোট ১১টি দেশ ছাড়া পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র এই ধর্মানুসারী, অন্তত নামে হলেও। ‘গণতান্ত্রিক খোদায়’ বিশ্বাস মোটাদাগে গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্রপূজার সাথে সম্পৃক্ত, ১৯ শতকের ঘটনাপ্রবাহে যার জন্ম। প্রভু এবং চার্চ

প্রতিস্থাপিত হয়েছে রাষ্ট্র এবং পবিত্রতম জাতির পিতাদের মাধ্যমে। চাকরি, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা এবং শিক্ষালাভের আশায় আমরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রবেদিতে পূজাপাঠ সম্পন্ন করে থাকি। আমাদের সর্বোচ্চ ঈমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। আমরা বিশ্বাস করি এই প্রভু সর্বজনের হিতকরকরণ ও মঙ্গলসাধনে সক্ষম। 'তিনি' পুরস্কার দাতা, তিনি বিচারক, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বশক্তিমান। এবং আমরা মনেপ্রাণে কামনা করি 'তিনি' আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

গণতান্ত্রিক প্রভুর সৌন্দর্য হচ্ছে তিনি আমাদেরকে সবকিছু দান করেন, কোনো ধরনের স্বার্থচিন্তা ছাড়াই। প্রভুর মতো রাষ্ট্রেরও কোনো স্বার্থ নেই, ব্যক্তিস্বার্থ। তিনি জনকল্যাণের নিখাদ, নিঃস্বার্থ অভিভাবক। এমনকি তিনি কোনো বিনিময়ও চান না। মুক্তহস্তে তিনি আমাদের রুটি, রুজি, মাছ, মাংস এবং অন্যান্য আহার্যের জোগান দিয়ে থাকেন। অন্তত জনগণ এভাবেই দেখে থাকে। বেশিরভাগ মানুষ সরকারপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাই বিবেচনা করে। এর জন্য কী মূল্য পরিশোধ করতে হয়, তা দেখে না। কারণ হচ্ছে সরকার এত ধুরন্ধরতার সাথে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, পরোক্ষভাবে ট্যাক্স সংগ্রহ করে যে আমজনতা বুঝতেই পারে না তাদের আয়ের ঠিক কতটুকু সরকার খেয়ে দেয়। যেমন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আহরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়, নিয়োগদাতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় সামাজিক নিরাপত্তাকর আদায়ের, অর্থবাজার থেকে সরকারের গৃহীত ঋণ যার শেষ বোঝাটা কর আদায়কারীদের ঘাড়েই চাপে, একদিন না একদিন এটি তাদেরই পরিশোধ করতে হয়। কখনো জনগণের অর্থ হাতিয়ে নেয় ইনফ্ল্যাশনের মাধ্যমে। এভাবে জনগণের কী পরিমাণ সম্পদ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিচ্ছে তা টেরই পাওয়া যায় না।

এই বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সরকারের কর্মকাণ্ডের ফলাফল দৃশ্যমান ও ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য। কিন্তু যদি সরকার জনগণের অর্থগুলো হাতিয়ে না নিত, তবে কী ঘটত, তা অদৃশ্য। সেই টাকাগুলো দিয়ে কী কী করা যেত বা করা উচিত, সেসব অনালোচিত। জনগণের পয়সায় নির্মিত জেট ফাইটার বিমানগুলো তো দৃশ্যমান, কিন্তু যুদ্ধবিমানে বিনিয়োগ করতে গিয়ে আরও কী কী গুরুত্বপূর্ণ খাতে অর্থব্যয় করা যায়নি, তা দৃশ্যপটে অনুপস্থিত।

গণতান্ত্রিক বিশ্বাস এত দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, গণতন্ত্র এখন রাজনৈতিকভাবে সঠিক ও নৈতিক সবকিছুর প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্র মানে স্বাধীনতা (ভোট প্রদানের স্বাধীনতা), সমতা (সবার ভোট সমান মূল্যধারণ করে), সাম্য (সবাই সমান), ঐক্য (আমরা সবাই মিলে ভোটের মাধ্যমে

ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি) ও শান্তি (গণতন্ত্র কখনোই অনৈতিক-অন্যায্য যুদ্ধ শুরু করে না)! এ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিপরীত হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র। দুনিয়ায় যা-কিছু নিন্দনীয়, সবকিছুর জন্য স্বৈরতন্ত্র দায়ী; স্বাধীনতার অভাব, অসাম্য, যুদ্ধ এবং অবিচার।

১৯৮৯ সালে নিও-কনজার্ভেটিভ চিন্তক ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা তো তার বিখ্যাত রচনা 'দ্য অ্যান্ড অব হিস্টোরি'তে দাবি করে বসেছেন যে আধুনিক পশ্চিমা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হচ্ছে মানবজাতির রাজনৈতিক বিবর্তনের সর্বোচ্চ চূড়া! তার ভাষায়—'মানব-সরকার বা হিউম্যান গভর্মেন্টের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে বর্তমানে আমরা পশ্চিমা লিবারেল ডেমোক্রেসির (উদারনৈতিক গণতন্ত্র) বিশ্বায়ন দেখতে পাচ্ছি!' একমাত্র শয়তানের চ্যালারাই এরকম পবিত্র বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলার দুঃসাহস দেখায়; সন্ত্রাসী, চরমপন্থী এবং ফ্যাসিস্টরা।

গণতন্ত্র : সর্বসংহতিবাদ (কালেক্টিভিজম)

এই বইয়ে আমরা মূলত গণতান্ত্রিক খোদার (গড অব ডেমোক্রেসি) বিরুদ্ধে কথা বলব, বিশেষত জাতীয় সংসদীয় গণতন্ত্র। ছোট কম্যুনিটি, ছোট ছোট অ্যাসোসিয়েশন-সহ কিছু ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া যদিও উপকারী, কিন্তু জাতীয় সংসদীয় গণতন্ত্র যত না উপকারী তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতিকর। অথচ পশ্চিমা প্রায় সব দেশই সংসদীয় গণতান্ত্রিক। আমাদের যুক্তিতর্কের মূল পয়েন্ট হচ্ছে—সংসদীয় গণতন্ত্র অনৈতিক। আমলাতন্ত্র ও স্থবিরতার বাহক। স্বাধীনতা, সাবলম্বন ও উদ্যমতা ব্যাহতকারী। এটি অনিবার্যভাবেই বিদ্বেষ, হানাহানি, অনধিকারচর্চা, জড়তা, আড়ষ্টতা এবং অপচয়ের চালিকাশক্তি। দায়িত্ব পালনে রাজনৈতিক ব্যক্তিবিশেষের ব্যর্থতা, ভুল দলের ক্ষমতা গ্রহণ বা অন্য কোনো কারণে নয়; বরং এজন্য যে খোদ শর্ষেতেই রয়েছে ভূত। গণতান্ত্রিক সিস্টেম যেভাবে কাজ করে, সেটিই ত্রুটিপূর্ণ।

গণতন্ত্রের প্রধান পরিচয়চিহ্ন হচ্ছে—সমাজ পরিচালিত হবে জনগণ সিদ্ধান্তে। তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ভিন্ন ভাষায়, আমাদের সবকিছু আমরাই সিদ্ধান্ত নেব, যৌথভাবে। কী পরিমাণ ট্যাক্স উসুল করা হবে, চাইল্ডকেয়ারে কত ব্যয় হবে, বৃদ্ধাশ্রমে যাবে কত, কত বছর বয়স হলে মদ গিলতে শুরু করবে, নিয়োগদাতারা কর্মচারীদের কতটুকু পেনশন দেবে, পণ্যের ওপর কী লেবেল লাগানো হবে, স্কুলে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে, উন্নয়নখাতে কত টাকা ব্যয় হবে, নবায়নযোগ্য এনার্জি বা খেলাধুলার বাজেট কত হবে, নাচগান আর বাদ্যদলে কত যাবে, বার মালিক তার মদের বার কীভাবে চালাবে, গেস্টরা ভেতরে বসে সিগারেট ফুঁকতে পারবে কি না, ঘরবাড়ি কীভাবে নির্মিত হবে, সুদহার কতটুকু হবে, অর্থনীতিতে কী পরিমাণ অর্থ

সার্কুলেশন হবে, ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হয়ে গেলে করদাতাদের পয়সায় বেইল আউট করা হবে কি না, কে নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দিতে পারবে, কে হাসপাতাল চালানোর যোগ্য, জীবনের ঘানি টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে গেলে মানুষ নিজেকে মেরে ফেলার অধিকার থাকবে কি না, কখন এবং কী শর্তে রাষ্ট্র যুদ্ধে জড়াবে—সব আমরা সিদ্ধান্ত নেব। সম্মিলিতভাবে, মিলেমিশে। গণতন্ত্রে এই সবগুলো এবং এরকম আরও হাজারো সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জনগণ।

ফলে দেখা যাচ্ছে সংজ্ঞা অনুযায়ী গণতন্ত্র একটি 'সর্বসংহতিমূলক' বা কালেক্টিভিস্ট সিস্টেম। পেছনের দরজা দিয়ে দেখলে এটিই সোশ্যালিজম। গণতন্ত্রের পেছনে মূল ধারণাটা হচ্ছে শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো জনগণের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করা ভালো এবং এটিই কাম্য। জনগণ তাদের পক্ষ থেকে সংসদে প্রতিনিধি প্রেরণ করে, ভিন্ন অর্থে রাষ্ট্রকে তাদের পক্ষ হয়ে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করে। অর্থাৎ গণতন্ত্রে গোটা সমাজব্যবস্থা রাষ্ট্রমুখী। সে ক্ষেত্রে গণতন্ত্র মানবজাতির রাজনৈতিক বিবর্তনের অনিবার্য ও সর্বোচ্চ চূড়া—এটি একটি বিভ্রান্তিকর দাবি। বরং গণতন্ত্রের অতি সংকীর্ণ রাজনৈতিক প্রকাশ লুকিয়ে রাখার জন্য প্রচারিত নিছক প্রোপাগান্ডা, মিথ্যা ছদ্মাবরণ। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার পর্যাপ্ত যৌক্তিক বিকল্প রয়েছে। বিকল্পগুলোর একটি হচ্ছে ফ্রিডম। ভিন্নশব্দে লিবারেলিজম। শব্দের ক্লাসিক্যাল অর্থ অনুযায়ী। বর্তমানে পশ্চিমে লিবারেলিজম সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই ফ্রিডম বা স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মতো নয় এবং তা অদৃষ্টপূর্বও নয়। ধরুন, কেউ তার কাপড়চোপড়ের জন্য কত টাকা ব্যয় করবে এটি কি আমরা বসে 'গণতান্ত্রিকভাবে' সিদ্ধান্ত নিই? আমি কোন সুপারমার্কেটে যাব? অবশ্যই নয়। সবাই যার যার পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নেয়। এবং এই ফ্রিডম অব চয়েজ খুব ভালোভাবে কাজ করছে। তাহলে যেসব সিদ্ধান্তগুলো গণতান্ত্রিকভাবে নিচ্ছি সে ক্ষেত্রে কেন এটি কাজ করবে না? আমাদের কাজের ক্ষেত্র, স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয় কেন গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে?

এমন কি হতে পারে না যে গণতান্ত্রিকভাবে আমরা যেসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, অর্থনৈতিক-সামাজিক সব সিদ্ধান্তই রাষ্ট্র কর্তৃক বা রাষ্ট্রের মাধ্যমে নেওয়া হচ্ছে, এটিই আমাদের সমাজের সব অসুস্থতার জন্য দায়ী? এটি সবকিছুর অন্তর্নিহিত কারণ হতে পারে না? আমলাতন্ত্র, সরকারের অনধিকারচর্চা, পরজীবীতা, অপরাধ, দুর্নীতি, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, শিক্ষার নিম্নমান ইত্যাদি গণতন্ত্রের অভাবে তৈরি হয়নি; বরং **গণতন্ত্রের কারণে** তৈরি হয়েছে— এটা কি অসম্ভব কিছু?

এই বইতে এটিই আমরা আপনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে আগ্রহী।

বইটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আমরা 'সংসদীয় গণতান্ত্রিক খোদার' ওপর আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করেছি। আর ১০টা ধর্মের মতোই গণতন্ত্রের কিছু নিজস্ব 'বিশ্বাস' রয়েছে। রয়েছে কিছু অন্ধবিশ্বাস; যা সবাই বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় অমোঘ সত্য বলে মেনে নিয়েছে। গণতন্ত্রের ১৩টি মিথ বা কুসংস্কারের আদলে আমরা তা পেশ করব।

দ্বিতীয় ভাগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাস্তব, ব্যাবহারিক ও প্রায়োগিক কুফল নিয়ে আলোচনা করব। আমরা দেখিয়ে দেবো কেন গণতন্ত্রের অনিবার্য গন্তব্য—স্থবিরতা, অদক্ষতা এবং অবিচার। তৃতীয় ধাপে আলোচনা করব গণতন্ত্রের বিকল্প নিয়ে। স্বায়ত্তশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার ও ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে নতুন সিস্টেম দাঁড় করাব।

বর্তমান সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী। যারা হতাশাবাদী, তাদের হতাশার একটি কারণ হচ্ছে তারা বর্তমান সিস্টেমকে চিরস্থায়ী বিবেচনা করছে, আকর্ষণীয় বিকল্প দাঁড় করানোর কথা ভাবছে না। তারা দেখছে—সরকার তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। তাদের সামনে একমাত্র বিকল্প হচ্ছে চাইনিজ মডেলের ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ কিংবা চরমপন্থা। এখানেই তারা ভুল করছে। গণতন্ত্র কোনোভাবেই স্বাধীনতা নয়। এটি নিছক স্বৈরতন্ত্রের ভিন্নরূপ; সংখ্যাগুরু এবং রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্র। এটি সুশাসন, সমতা, সংহতি এবং শান্তির প্রতিশব্দও নয়। জাস্ট ধোঁকা।

আজ থেকে মাত্র ১৫০ বছর পূর্বে নানা কারণে অধিকাংশ পশ্চিমা রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের জন্ম হয়। তখন যে কারণেই জন্ম হয়ে থাকুক না কেন, এখনো সংসদীয় গণতন্ত্রের ঘানি টানার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এটি এখন আর কাজ করছে না। নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। উৎপাদনশীলতা এবং সংহতি গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ না করে, জনগণের পারস্পরিক স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্কের মাধ্যমে নির্ণীত হওয়া দরকার।